بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৯ আগস্ট, ২০২৫ মোতাবেক ২৯ যহুর, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হুনাইনের যুদ্ধ সম্পর্কে আজও বিশদ আলোচনা করব। মহানবী (সা.) মক্কা থেকে রওয়ানা হবার সময় হযরত আত্তাব বিন আসীদ (রা.)-কে মক্কার আমীর নিযুক্ত করেন। তিনি মক্কায় নিযুক্ত প্রথম আমীর ছিলেন। সে সময় হযরত আত্তাবের বয়স ছিল আনুমানিক বিশ বছর। মক্কার লোকদের ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষা দেবার দায়িত্ব তিনি (সা.) হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)-র ওপর অর্পণ করেন। হযরত আত্তাবের পরিচয় হলো– তার পিতার নাম ছিল আসীদ বিন আবুল ঈস বিন উমাইয়া। পিতা-পুত্র উভয়ই কুরাইশ গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিল এবং ইসলামের কঠোর বিরোধী ছিল। তার মায়ের নাম ছিল যয়নব। আত্তাবের পিতা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে। ইসলামের প্রতি আত্তাবের ঘৃণা ও বিদ্বেষের মাত্রা এমন ছিল যে, মক্কা বিজয়ের দিন যখন হযরত বেলাল (রা.) কা'বা শরীফে আযান দেন তখন আত্তাব তার সঙ্গীদের বলে, আল্লাহ্র অশেষ কৃপা যে, আমার পিতা এ আযান শোনার পূর্বেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। যাহোক, এরপর মক্কা বিজয়ের দিন আত্তাব মুসলমান হয়ে যান। মহানবী (সা.) একবার স্বপ্নে তার পিতা আসীদ বিন আবুল ঈসকে মুসলমান অবস্থায় মক্কার শাসক হিসেবে দেখতে পান। সে তো কাফির অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে। আর এখন মহানবী (সা.)-এর এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা তার পুত্র হযরত আত্তাব (রা.)-র (ইসলাম গ্রহণের) মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এক বর্ণনানুযায়ী, মহানবী (সা.) স্বপ্নে দেখেন, আত্তাব জান্নাতের দরজার সামনে আসে এবং খুব জোরে দরজায় কড়া নাড়ে, অবশেষে দরজা খোলা হলে সে এতে প্রবেশ করে। অপর এক বর্ণনানুসারে, মহানবী (সা.) বলেন, আমি স্বপ্নে আত্তাবের পিতা আসীদকে জান্নাতে দেখতে পাই, যে কাফির ছিল এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। আমি ভাবতে থাকি, আসীদ কীভাবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে? মক্কা বিজয়ের দিন যখন আত্তাব বিন আসীদ সামনে আসে তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমি (স্বপ্নে) একেই জান্নাতে দেখেছি, তাকে আমার সামনে নিয়ে আসো। তাকে মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থিত করা হয়, তিনি (সা.) তখন তাকে মক্কার আমীর নিযুক্ত করেন এবং বলেন, হে আত্তাব! তুমি কি জানো আমি কাদের ওপর তোমাকে আমীর নিযুক্ত করেছি? আমি তোমাকে আহলুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্র পরিবার-পরিজনের ওপর আমীর নিযুক্ত করেছি, তাই তাদের সঙ্গে সদাচরণ করবে। মহানবী (সা.) তাকে একথা তিনবার বলেন। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু অবধি তিনি মক্কার শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অন্য একটি বর্ণনানুযায়ী, হযরত আবু বকর (রা.)-র শাসনামলেও তিনি মক্কার শাসক ছিলেন এবং তিনি ঐ দিনই মৃত্যুবরণ করেন যেদিন হযরত আবু বকর (রা.) ইহলোক ত্যাগ করেন। অপর এক বর্ণনানুসারে তিনি হযরত উমর (রা.)-র খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

মক্কা থেকে হুনাইনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার ব্যাপারে উল্লেখ আছে, মহানবী (সা.) ৬ শাওয়াল শনিবার হুনাইনের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করেন এবং ১০ শাওয়াল হুনাইন প্রান্তরে পৌঁছান। ইবনে কাসীরের মতে, ৫ শাওয়াল যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল। মহানবী (সা.) যখন

হুনাইনের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করেন তখন তাঁর দুইজন পবিত্র সহধর্মিণী, অর্থাৎ হযরত উম্মে সালামা (রা.) এবং হযরত যয়নব (রা.) তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন। কতিপয় বর্ণনানুসারে হযরত উম্মে সালামা (রা.) ও হযরত মাইমুনা (রা.) সাথে ছিলেন; কিন্তু নির্ভরযোগ্য বর্ণনানুযায়ী হযরত উম্মে সালামা (রা.) ও হযরত যয়নব (রা.) তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন।

মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে উল্লেখ আছে, হুনাইনের যুদ্ধে ইসলামী সৈন্যসংখ্যা যদিও শত্রুদের তুলনায় কম ছিল, কিন্তু তখন পর্যন্ত সংঘটিত পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধের তুলনায় সৈন্যসংখ্যা বেশি ছিল; আর তা কেবল সংখ্যার দিক থেকেই নয়, বরং অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকেও। মাগাযী (তথা যুদ্ধাভিযান) বিষয়ক পণ্ডিতরা লেখেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বারো হাজার মুসলমান সাথে নিয়ে যাত্রার সংকল্প করেন। দশ হাজার সাহাবী যারা মদীনা থেকে মক্কা বিজয়ের জন্য এসেছিলেন, তারা এই যুদ্ধে তাঁর (সা.) সঙ্গে ছিলেন; আর মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে দুই হাজার লোক তাঁর (সা.) সাথে রওয়ানা হয়। অনেকেই এই সংখ্যা চৌদ্দ হাজারও বলেছেন, কিন্তু বারো হাজারের বর্ণনাই বেশি পাওয়া যায়। মক্কার দুই হাজার নওমুসলিম অংশ নিয়েছিল। যারা চৌদ্দ হাজার বলে থাকেন, তারা মদীনা থেকে আগত মুসলমানদের সংখ্যা দশ হাজারের পরিবর্তে বারো হাজার বলে থাকেন, কিন্তু মক্কা থেকে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা দুই হাজারই বর্ণনা করেন।

হুনাইন যাবার পথে যাতে আনওয়াত নামের বড়ো একটি কুল বৃক্ষ ছিল, মুশরিকরা এটিকে অনেক সম্মান প্রদর্শন করত এবং বিজয়ের শুভ লক্ষণস্বরূপ নিজেদের অস্ত্র এতে ঝুলিয়ে রাখত, আর সেখানে তারা ইতিকাফও করত ও অনেক ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করত। (মুসলমান) কাফেলা যখন সেই কুল বৃক্ষের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল তখন মক্কার কয়েকজন নবদীক্ষিত মুসলমান মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করে, আমাদের জন্যও এমন কোনো বৃক্ষ নির্ধারণ করে দিন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহু আকবার! তোমরা তো সেই কথাই বললে যেমনটি মূসার জাতি মূসাকে বলেছিল–

يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰـهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِـهَةٌ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ (আল-আরাফ: ১৩৯)

অর্থাৎ, 'হে মূসা! তাদের যেমন অনেক উপাস্য রয়েছে, আমাদের জন্যও তেমনই একটি উপাস্য বানিয়ে দাও।' সে বলল, 'নিশ্চয় তোমরা এক বড়ো অজ্ঞ জাতি।' মহানবী (সা.) বলেন, যে সমস্ত কর্মকাণ্ড তোমরা করছো (এতে মনে হচ্ছে), তোমরাও নিশ্চয় সেই পূর্ববর্তী লোকদের পথই অনুসরণ করবে।

যেভাবে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, হুনাইনের যুদ্ধে সেই দুই হাজার নবদীক্ষিত মুসলমান যুবকও অংশগ্রহণ করেছিল, যাদের হৃদয়ে তখনও পর্যন্ত ইসলাম ও ঈমান পুরোপুরি দৃঢ় হয় নি, আর যুদ্ধের ক্ষেত্রেও তাদের বিশেষ কোনো দক্ষতা ছিল না, এমনকি তারা অস্ত্রের ক্ষেত্রেও তেমন গুরুত্ব দেয় নি। আর এরাই সে-সকল লোক যাদের কারণে হুনাইনের যুদ্ধে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যা সাময়িক উদ্‌বেগ ও পিছু হটার কারণ হয়েছিল। তেমনিভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে মক্কা থেকে এমন কিছু লোকও যাত্রা করে যারা মুসলমান ছিল না। কেউ কেউ বাহনে আরোহিত অবস্থায়, আবার কেউ পায়ে হেঁটে যাত্রা করে। এমনকি কতিপয় নারীও যাত্রা করে, যাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল এটি দেখা যে, যুদ্ধের ফলাফল কী হয়। যদি মুসলমানরা বিজয় লাভ করে তাহলে তারা মালে গনিমত (তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) লাভ করবে। মহানবী (সা.) এবং সাহাবীদের কোনো দুঃখকষ্টে নিপতিত হওয়া নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তাদের মধ্যে একটি দল কেবলমাত্র মজা দেখার জন্য অংশগ্রহণ করেছিল,

যাদের মধ্যে কিছু মুশরিকও ছিল যারা মুশরিক অবস্থায় অংশগ্রহণ করেছিল। এই মুশরিকদের সংখ্যা আশির কাছাকাছি বলা হয়ে থাকে। এ কারণে কতিপয় জীবনীকার এ-ও বর্ণনা করেছেন যে, এটিই সর্বপ্রথম যুদ্ধ ছিল যেটিতে মহানবী (সা.) মুশরিকদের নিকট থেকেও সাহায্য নিয়েছেন, অথচ মহানবী (সা.) ইতিপূর্বে কোনো যুদ্ধেই কোনো মুশরিককে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেন নি। কেননা মহানবী (সা.) বলতেন, **إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ** অর্থাৎ, আমরা কোনো মুশরিকের কাছে সাহায্য চাই না। কিন্তু তাদের মতে, হুনাইনের যুদ্ধেই তিনি (সা.) প্রথমবার মুশরিকদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অথচ প্রকৃত বিষয় হলো, তিনি (সা.) তাদের নিকট থেকে কোনো সাহায্য নেন নি। মহানবী (সা.) যেখানে বদরের যুদ্ধেও কোনো মুশরিকের পক্ষ থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, যখন এক-একজন মানুষের অনেক প্রয়োজন ও গুরুত্ব ছিল, সেক্ষেত্রে এখন যখন মুসলমানদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের সংখ্যাধিক্য তাদেরকে অহংকারে নিপতিত করেছিল– তাহলে এখন মুষ্টিমেয় কিছু মুশরিকের সাহায্যের কেন প্রয়োজন পড়বে? অতএব, মহানবী (সা.) কখনও কোনো মুশরিককে সৈন্যদলে অন্তর্ভুক্ত করেন নি, আর কখনও কোনো মুশরিককে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যও বলেন নি। বরং জীবনীগ্রন্থসমূহের বিস্তারিত বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, মক্কার অনেক লোক কেবল যুদ্ধ দেখার জন্য এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লোভে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল। তাদের মনোভাব এরূপ ছিল: মুসলমানরা তো (যুদ্ধে) জয়ী হবেই; চলো, গিয়ে মজা দেখি আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদে ভাগ বসাই! অবশ্য কিছু মুশরিকের দুরভিসন্ধিও ছিল আর তারা দুরভিসন্ধি নিয়েই অংশগ্রহণ করে; যারা মক্কার পরাজয়ের গ্লানি ও অপমান ভুলতে পারছিল না এবং যেভাবে এই লোকেরা মহানবী (সা.)-কে মক্কায় হত্যার বিফল চেষ্টা করেছিল, তারা এখানেও (এই আশায়) এসেছিল যে, শত্রুরা যদি [মহানবী (সা.)-কে] হত্যা করতে না পারে, তবে হতে পারে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ আমরা পেয়ে যাব এবং নাউযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.)-কে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবার মাধ্যমে আমরা আমাদের হৃদয় প্রশান্ত করতে পারব। যাহোক, মক্কা থেকে বারো হাজার সৈন্য যাত্রা করে তিন দিনের, আবার কতকের মতে পাঁচ দিনের যাত্রা শেষে তারা হুনাইন উপত্যকায় পৌঁছায়। পথিমধ্যে কোথাও কোনো ঢাল, তলোয়ার বা সাহাবীদের কোনো সরঞ্জাম (অজ্ঞাতে) পড়ে গেলে আবু সুফিয়ান বিন হারব মহানবী (সা.)-কে বলতেন, আমাকে এই জিনিসটি নেবার অনুমতি দিন, আমি তা তুলে নিচ্ছি; এমনকি এসব সরঞ্জামে তার উট বোঝাই হয়ে যায়।

হযরত সাহল বিন হানযালিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, হুনাইনের (যুদ্ধের) দিন তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে হাঁটছিলেন। তারা অনেক দীর্ঘ সফর করেন, এমনকি সন্ধ্যা হয়ে যায়। আমি মহানবী (সা.)- এর সাথে নামাযে অংশগ্রহণ করি। সেসময় বাহনে চড়ে একজন এসে মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি আপনাদের সামনে সামনে চলছিলাম। আমি অমুক অমুক পাহাড়ে আরোহণ করলে দেখতে পাই, হাওয়াযিনের লোকেরা নিজেদের স্ত্রী-পরিজন, উট, ছাগল এবং গৃহপালিত পশুগুলো নিয়ে সমবেত হয়েছে। তখন মহানবী (সা.) মৃদু হেসে বলেন, আগামীকাল ইনশাআল্লাহ্ এগুলো মুসলমানদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদে পরিণত হবে। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, আজ রাতে কে আমাদের পাহারা দেবে? হযরত আনাস বিন আবি মারসাদ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি (পাহারা) দেবো। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে (ঘোড়ায়) আরোহণ করো। তিনি

(রা.) নিজ ঘোড়ায় আরোহণ করে মহানবী (সা.)-এর নিকট আসেন। মহানবী (সা.) বলেন, ঐ গিরিপথে যাও। [এ প্রহরা তাঁর (সা.) নিজের জন্য ছিল না, বরং তিনি (সা.) আশপাশের এলাকার খবরাখবর নেবার ও সেখানে পাহারা দেবার জন্য বলেছিলেন।] (তিনি বলেন,) আর এর উঁচু স্থানে যাও এবং তোমার কারণে যেন (আমরা) রাতে প্রতারিত না হই। অর্থাৎ এমনটি যেন না হয়, তোমার অসাবধানতার কারণে শত্রু (আমাদের ওপর আক্রমণ করে) প্রতারিত করে। পরদিন প্রত্যুষে মহানবী (সা.) তাঁর নামাযের স্থানের উদ্দেশ্যে বের হন। তিনি (সা.) ফজরের দুই রাকআত সুন্নত আদায় করেন; নামাযের জন্য ইকামত দেওয়া হয় এবং মহানবী (সা.) নামায পড়ানো শুরু করেন। তাঁর (সা.) মুখ গিরিপথের দিকে ছিল। তিনি (সা.) নামায শেষে সালাম ফেরানোর পর বলেন, আনন্দিত হও! তোমাদের জন্য সুসংবাদ, কেননা তোমাদের অশ্বারোহী (সেই প্রহরী) ফেরত এসেছে। [অর্থাৎ নিরাপত্তা প্রহরায় নিয়োজিত সেই সাহাবী।] সাহাবীরা (রা.) বলেন, আমরা গিরিপথের গাছপালার দিকে দেখতে থাকি, এমনকি তিনি ফেরত আসেন এবং এসে মহানবী (সা.)-এর সামনে দাঁড়িয়ে যান। তিনি সালাম দিয়ে বলেন, আমি চলতে চলতে সেই উপত্যকার সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছাই যেখানে যাবার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রত্যুষে আমি উভয় উপত্যকায় আরোহণ করে দেখেছি, কিন্তু সেখানে (শত্রুপক্ষের) কাউকে পাই নি। তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, রাতে কি তুমি নীচে নেমেছিলে? তিনি বলেন, না; শুধুমাত্র নামায ও প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেবার জন্য (নীচে নেমেছিলাম)। মহানবী (সা.) সেই সাহাবীকে বলেন, তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব বা নিশ্চিত হয়ে গেছে। তুমি খুবই ভালো দায়িত্ব পালন করেছ।

মুশরিকদের গোয়েন্দাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহানবী (সা.) ১০ শাওয়াল মঙ্গলবার এশার সময় হুনাইনে পৌঁছে গিয়েছিলেন। হাওয়াযিন গোত্রের তিন ব্যক্তিকে মালিক বিন অওফ গোয়েন্দা হিসেবে প্রেরণ করে যেন সে মুসলমানদের সৈন্যবহরে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং এসে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারে। কিন্তু এই তিনজন যখন ফিরে আসে তখন তারা ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। মালিক বলে, তোমাদের অমঙ্গল হোক! তোমাদের কী হয়েছে? তারা উত্তর দেয়, আমরা ঘোড়ার ওপর সাদা রঙের (কাপড় পরিহিত) মানুষদের দেখেছি। আল্লাহ্র কসম! যুদ্ধ যদি হয়েই যায় তবে আমরা পরিস্থিতি সামলাতে পারব না। আল্লাহ্র কসম! আমরা পৃথিবীবাসীর সাথেই যুদ্ধ করার সামর্থ্য রাখি না, সেখানে ঊর্ধ্বলোকের অধিবাসীদের সাথে কীভাবে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবো! আমাদের কথা যদি তুমি শোনো তাহলে বলি, তুমি নিজ জাতিকে নিয়ে ফেরত চলে যাও। মানুষজন যদি সেই চিত্র দেখে যা আমরা দেখে এসেছি, তাহলে তারাও সেভাবে আতঙ্কিত হবে যেভাবে আমরা হয়েছি। সে বলে, তোমরা ধ্বংস হও! তোমরা সৈন্যদের মাঝে সবচেয়ে ভীতু। সে তাদেরকে এই ভয়ে লুকিয়ে রাখে যেন পুরো সৈন্যবাহিনীতে এই সংবাদ ছড়িয়ে না পড়ে; (তাদেরকে) বাইরে যেতে দেয় নি। আর সে বলে, আমাকে সাহসী ব্যক্তির সন্ধান দাও। সেখানে উপস্থিত সবাই একজনের বিষয়ে একমত হয়ে বলে, এই ব্যক্তি অত্যন্ত সাহসী। তখন সে বের হয়, মালিক তাকে প্রেরণ করে। সে-ও দ্রুত ফেরত আসে। সে-ও একইরকম ভীতসন্ত্রস্ত ছিল, যেমনটি তার পূর্বের তিন সঙ্গী ভীত ছিল। সে অর্থাৎ মালিক জিজ্ঞেস করে, তুমি কী দেখেছ? সেই সাহসী ব্যক্তি বলে, আমি এমন সাদা ব্যক্তিদের ডোরাকাটা ঘোড়ার ওপর দেখেছি যে, তাদের দিকে তাকানোরও সাহস কারো নেই। আল্লাহ্র কসম! আমার মাঝে এমন ভয় বিরাজ করছে যা তুমি দেখতে পাচ্ছো; আমি তা সামাল দিতে পারছি না। এর চেয়ে ভালো, আমরা এখান

থেকে ফেরত যাই। কিন্তু তবুও মালিক বিন অওফ নিজের অভিপ্রায় থেকে বিরত হলো না। শত্রুপক্ষের গোয়েন্দারা তাদের যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছে, জীবনীকারদের বর্ণনানুসারে সেগুলোর দুটি অর্থ হতে পারে। একদলের ধারণা হলো, এসব গোয়েন্দারা ফেরেশতাদের দেখেছে আর তাদেরকে দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছে। আরেকটি ধারণা হলো, এমনও হতে পারে– তারা যখন মুসলমান সৈন্যবাহিনী দেখে তখন এক ঐশী প্রতাপ তাদের ওপর এমনভাবে ছেয়ে যায় যে, তারা ভীতত্রস্ত হয়ে পড়ে।

হযরত সালামা বিন আকওয়া বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে হাওয়াযিনের ওপর আক্রমণ করি আর সে সময়েই সকাল বেলা এক ব্যক্তি উটে চড়ে আসে। আমরা তখন মহানবী (সা.)-এর সাথে খাবার খাচ্ছিলাম। সেই ব্যক্তি নিজের উটকে বসিয়ে রশি দিয়ে বাঁধে এবং সামনে এসে তাদের সাথে বসে খাবার খায়। [অর্থাৎ সাহাবীদের সাথে বসে যায়।] অপর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, সে লোকদের সাথে কথা বলতে থাকে। তিনি (রা.) বলেন, আমরা যথেষ্ট ক্লান্তও ছিলাম, বাহনও কম ছিল। তারপর সেই ব্যক্তি তাদের সাথে কথা বলার পর দ্রুত তার উটের দিকে চলে যায় আর তাড়াতাড়ি সেটির বাঁধন খুলে সেটির ওপর আরোহণ করে এবং উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। তখনই মহানবী (সা.) তাকে দেখে ফেলেন এবং বলেন, এই ব্যক্তি গোয়েন্দা, একে ধরো এবং হত্যা করো। বনু আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি উটের পিঠে চড়ে তার পিছু নেয়। হযরত সালামা বর্ণনা করেন, আমি আমার উটে চড়ে তার পেছন পেছন ছুটলাম। তার নিকটে পৌঁছে সামনে থেকে তার উটের লাগাম ধরে ফেললাম। আমি তার উটকে বসালাম। উট যখন তার হাঁটু মাটিতে রাখে তখনই আমি তরবারি দিয়ে আক্রমণ করি এবং সেই ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করি আর সে নীচে পড়ে যায়। আমি তার উট, অস্ত্রশস্ত্র ও সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে নিই এবং মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হই। মহানবী (সা.) লোকদের জিজ্ঞেস করেন, তাকে মেরেছে কে? সাহাবীরা (রা.) বলেন, ইবনে আকওয়া। তখন মহানবী (সা.) বলেন, এসব জিনিসপত্রও তার।

মুসলমানদের বারো হাজার সৈন্যের বিপরীতে শত্রুদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। হুনাইনের যুদ্ধের বর্ণনা করতে গিয়ে কখনো শত্রুসংখ্যা ত্রিশ হাজার বর্ণনা করা হয়ে থাকে, কখনো বিশ হাজার এবং কখনো চার হাজার। এর বিস্তারিত বর্ণনা হলো, শত্রুপক্ষের যোদ্ধার সংখ্যা ছিল বিশ হাজার; আর তাদের স্ত্রী-সন্তানদের যোগ করলে সংখ্যা ত্রিশ হাজার হয়ে যায়। আর মালিক বিন অওফ তার সেনাদলের মাঝ থেকে সবচেয়ে দক্ষ তিরন্দাজদের বাছাই করে পাহাড়ের ওপর লুকিয়ে রাখে, যারা ওত পেতে বসে ছিল এবং মুসলমানদের ওপর আচমকা একযোগে আক্রমণ করে মুসলমান সেনাদের মাঝে বিক্ষিপ্ত অবস্থা সৃষ্টি করেছিল; এদের সংখ্যা ছিল চার হাজার।

বনু হাওয়াযিনের সেনাপতি মালিক বিন অওফ তার সৈন্যবাহিনী এভাবে সাজিয়েছিল যে, রাতের দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে মালিক বিন অওফ তার সেনাদের কাছে আসে এবং হুনাইন উপত্যকার নির্ধারিত বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে রাখে। এই উপত্যকা এমন যে, এতে অনেক গিরিপথ ও গিরিখাত ছিল। সেগুলোতে সে সৈন্যদের ছড়িয়ে দেয় আর তারা সেখানে ওত পেতে বসে যায়, যেন তারা মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের ওপর একযোগে আকস্মিক আক্রমণ করতে পারে। কাফিরদের সৈন্যবহর এমনভাবে সাজানো ছিল যে, সর্বাগ্রে ছিল তাদের অশ্বারোহী বাহিনী, তাদের পেছনে পদাতিক বাহিনী, তাদের পেছনে উটের ওপর নারীরা ও তাদের সন্তানেরা, আর তাদের পেছনে অন্যান্য জিনিসপত্র, উট, ভেড়া, ছাগল এবং অন্যান্য গবাদি পশু।

মক্কা থেকে হুনাইন অভিমুখে যাত্রাকালে মহানবী (সা.) বনু সুলাইমের এক হাজার অশ্বারোহীর দলটিকে অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে রাখেন এবং সেটির নেতৃত্ব হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-র ওপর ন্যস্ত ছিল। সৈন্যবাহিনী জিরানা নামক স্থানে পৌঁছালে পরে সেহরীর সময় মহানবী (সা.) সকল সৈন্যকে 'মাইমানা' অর্থাৎ দক্ষিণ সমর, 'মাইসারা' অর্থাৎ উত্তর সমর এবং 'কালব' অর্থাৎ মধ্য-সমরে বিন্যস্ত করেন। মহানবী (সা.) মধ্যবর্তী অংশে ছিলেন। তিনি (সা.) মুহাজির ও আনসারের মাঝে বড়ো পতাকা বণ্টন করেন। মুহাজিরদের একটি পতাকা তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে অর্পণ করেন; একটি পতাকা তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং একটি পতাকা হযরত উমর ফারুক (রা.)-কে প্রদান করেন। আনসারের মধ্য থেকে খাযরাজ-এর পতাকা হযরত হুবাব বিন মুনযির (রা.)-কে এবং অওস-এর পতাকা হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.)-কে প্রদান করেন। একইভাবে হযরত আবু বুরদা বিন নিয়ার, হযরত আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনযির এবং হযরত কাতাদা বিন নুমান (রা.)-কেও পতাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া মহানবী (সা.) বিশটির অধিক ছোটো ছোটো পতাকাও বিভিন্ন দলের মাঝে বণ্টন করেন।

হুনাইনের দিন কেউ একজন বলেন, আজকে আমাদের সংখ্যালঘুতার কারণে পরাজিত হতে হবে না, অর্থাৎ আজকে আমরা সংখ্যায় অনেক বেশি। কিন্তু এ কথাটি মহানবী (সা.) ভীষণ অপছন্দ করেন। আর পবিত্র কুরআনও এ বিষয়টিকে অপছন্দের দৃষ্টিতে এভাবে উপস্থাপন করেছে, إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ (আত-তাওবা: ২৫) অর্থাৎ তোমাদের সংখ্যাধিক্য যখন তোমাদেরকে অহংকারী করে তুলেছিল। হুনাইনের যুদ্ধে প্রাথমিক বিজয় মুসলমানদের হয়েছিল। তারপর শত্রুপক্ষের শক্তিশালী আক্রমণের ফলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, যার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে; আর সাময়িক পরাজয় হয়। কিন্তু পরিশেষে মুসলমানরা বিরাট জয় লাভ করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, হুনাইনের যুদ্ধের বিষয়ে সাধারণত এটি বলা হয়ে থাকে যে, মুসলমানদের সৈন্যবাহিনী ভোরের অন্ধকারে হুনাইন উপত্যকায় প্রবেশ করে, অপরদিকে কাফিরদের সৈন্যরা পূর্বেই উপত্যকায় পৌঁছে গিয়েছিল। আর তাদের সর্বোত্তম, দক্ষ তিরন্দাজরা সেখানে গিরিপথগুলোতে লুকিয়ে ছিল। মুসলমানরা সে সম্বন্ধে অনবহিত অবস্থায় যখন উপত্যকায় প্রবেশ করে তখন সেই তিরন্দাজরা একযোগে ঝটিকা আক্রমণ করে বসে, যার ফলে মুসলমান সৈন্যবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে আর তারা পেছনে পালাতে থাকে, এমনকি সেখানে কেবল মহানবী (সা.) এবং তাঁর কয়েকজন সাহাবী রয়ে যান। এরপর যখন মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে বার বার আহ্বান করা হয়, তখন মুসলমান সৈন্যরা ফেরত আসে এবং শত্রুদের সাথে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয় আর শত্রুরা মারাত্মকভাবে পরাজিত হয় ও যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যায়। এটি ইবনে হিশামের সীরাত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সহীহ বুখারীতে একটি রেওয়ায়েত আছে, সেখানে হুনাইনের যুদ্ধের কিছুটা ভিন্ন বর্ণনা উল্লিখিত আছে।

হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হযরত বারা বিন আযেবের বর্ণনা সহীহ বুখারীতে অনেক স্থানে রয়েছে, যেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন, যখন আমরা বনু হাওয়াযিনের ওপর আক্রমণ করি তখন তারা পরাজিত হয়ে পিছু হটে আর আমরা মালে গনিমত সংগ্রহ করতে শুরু করি। সে সময় তারা আমাদের ওপর তির দ্বারা উপর্যুপরি আক্রমণ শুরু করে, যার দরুন যে-সব যুবকের কাছে আত্মরক্ষার কোনো সরঞ্জাম ছিল না, তারা উলটো ঘুরে পালাতে থাকে। কিন্তু মহানবী (সা.) সে অবস্থাতেও যুদ্ধের মাঠে অবিচলতার সাথে অবস্থান

করেন। বর্ণনাকারী বারা বিন আযেব বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে দেখলাম, তিনি (সা.) সাদা খচ্চরের ওপরে আরোহিত ছিলেন এবং আবু সুফিয়ান বিন হারেস সেটির লাগাম ধরে রেখেছিলেন। আর তিনি (সা.) এই বাক্য বলছিলেন, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب অর্থাৎ আমি নবী– এতে কোনো মিথ্যা নেই, আর আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। বুখারীর এই বর্ণনাটি বাদ দিয়ে যদি দেখা হয় তাহলে হুনাইনের যুদ্ধে দুটি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল এবং সাধারণভাবে জীবনীকাররা এমনটিই বর্ণনা করে থাকেন। প্রথমত, (শত্রুর) অতর্কিত আক্রমণের ফলে মুসলমানদের ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়া এবং দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের পুনরায় একত্রিত হয়ে আক্রমণ করা এবং শত্রুদেরকে পরাস্ত করা। কিন্তু যদি বুখারীর এই বর্ণনাটিকে ভিত্তি ধরা হয় এবং এটিই অধিক সঠিক বলে মনে হয়, তাহলে হুনাইনের যুদ্ধের তিনটি ধাপ রয়েছে। প্রথম ধাপে মুসলমান সৈন্যদল নির্বিঘ্নে হুনাইন উপত্যকায় প্রবেশ করে এবং যে শত্রুদল তাদের সামনে ছিল তারা পিছু হটতে থাকে। আর মুসলমানরা যখন তাদের পিছু হটতে দেখে তখন মুসলমানদের একটি অংশ মালে গনিমত সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে যা হয় তা হলো, বনু হাওয়াযিনের সেনাপতি মালিক বিন অওফ তার যে সেরা চার হাজার তিরন্দাজকে গিরিপথে গোপনে মোতায়েন করে রেখেছিল, তারা যখন দেখল মুসলিম বাহিনী উপত্যকায় প্রবেশ করছে, তখন তারা একযোগে তিরের মাধ্যমে প্রবল আক্রমণ করে বসে। বনু হাওয়াযিন আরবের সেরা তিরন্দাজ ছিল। ভোরের অন্ধকার এবং মুসলিমদের একটি অংশ মালে গনিমত সংগ্রহে ব্যস্ত, এবং তাদের মধ্যেও একটি অংশ ছিল মক্কার সেই নওমুসলিমরা, যাদের হৃদয়ে ইসলাম তখনো ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং তাদের কাছে ঢাল বা বর্মের মতো আত্মরক্ষার বিশেষ কোনো সরঞ্জামও ছিল না, যা দিয়ে তারা তির থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারত। তাই তিরের এই আকস্মিক আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য এসব লোক সেখান থেকে দৌড় দেয়, সাথে তাদের বাহনও ছিল। যখন তারা হঠাৎ পেছনের দিকে দৌড় দেয় তখন সমগ্র বাহিনীতে এক অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে এবং উট ও ঘোড়াগুলোও দৌড়াতে শুরু করে; পশুগুলো ভড়কে যায়। গিরিপথ হবার কারণে রাস্তাও সংকীর্ণ ছিল, ফলে পশুগুলো মানুষজনকে পায়ের তলে পিষ্ট করতে থাকে। সেনাবাহিনীর এই হট্টগোলের কারণে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) আহত হয়ে ঘোড়া থেকে নীচে পড়ে যান এবং মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এটিও একটি সীরাতের পুস্তকে লেখা আছে।

তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পর্যায় এভাবে সংঘটিত হয় যা হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, সেনাবাহিনীর সামনের অংশ পলায়নপর হয়। সর্বপ্রথম বনু সুলাইমের দল পালিয়ে যায়, তাদের পিছু পিছু মক্কার নওমুসলিমরা, তারপর সাধারণ লোকেরাও তাদের পিছু পিছু পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় এবং তারা কারো পরোয়া করে নি। আর এত ধুলো উড়ছিল যে, তাদের মধ্যে কেউই হাতের তালু পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিল না। মহানবী (সা.) যত যুদ্ধ করেছেন সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, যুদ্ধক্ষেত্রে পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন– প্রতিটি যুদ্ধে তাঁর (সা.) অটল অবিচলতা এবং সাহসিকতার কোনো তুলনা নেই। যখন বড়ো বড়ো বীররাও পলায়নপর হতো, তখনো তিনি (সা.) সেখানে এক পাহাড়ের ন্যায় অবিচল থেকেছেন। হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) সবচেয়ে সুদর্শন, সবচেয়ে বেশি দানশীল ও লোকদের মাঝে সবচেয়ে সাহসী ছিলেন। এই হুনাইনের যুদ্ধের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত বারা বিন আযেব (রা.) বর্ণনা করেন, যখন সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং মহানবী (সা.) নিজের গুটিকয়েক সাহাবীসহ একলা রয়ে যান, আর শত্রুরা

তাঁর (সা.) দিকে ধাবিত হয়, সে সময় তিনি (সা.) একাই শত্রুদের দিকে অগ্রসর হন। আর উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকেন, আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। বর্ণনাকারী বলেন, খোদার কসম! যখন যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করত তখন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আশ্রয়ে চলে আসতাম; আর সেই ব্যক্তিকে সবচেয়ে সাহসী মনে করা হতো, যে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকটে থাকত। সেদিন তাঁর (সা.) সাহস ও বীরত্বের মাহাত্ম্য এমন ছিল যে, তিনি যখন একা রয়ে গিয়েছিলেন তখনও তিনি নিজের খচ্চরকে শত্রুদের দিকে এগিয়ে নিচ্ছিলেন। হযরত আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি এবং আবু সুফিয়ান বিন হারেস (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে সাথেই ছিলাম এবং এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হই নি।

যখন লোকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের খচ্চরকে শত্রুদের দিকে দ্রুত এগিয়ে নিতে লাগলেন; সে সময় আমি খচ্চরের লাগাম ধরে থামানোর চেষ্টা করতে থাকি যেন সেটি আরো দ্রুতগামী না হয়। আর আবু সুফিয়ান বিন হারেস (রা.) রেকাব ধরে রেখেছিলেন।

একটি রেওয়ায়েত অনুসারে, হযরত আবু বকর (রা.) যিনি সে সময়েও তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন, তিনি সে সময় খচ্চরের লাগাম ধরে সেটিকে থামানোর চেষ্টা করছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে বলেন, হে আব্বাস! বৃক্ষের লোকদের ডাকো। অর্থাৎ যারা হুদাইবিয়ার সময় জীবন উৎসর্গ করার অঙ্গীকারসহ বয়আত করেছিলেন। হযরত আব্বাস (রা.) উঁচু কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন; তিনি বলেন, আমি উচ্চৈঃস্বরে ডাকলাম, আসহাবুস সামুরা! অর্থাৎ বৃক্ষের লোকেরা কোথায়? তিনি বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র কসম! যখন লোকেরা আমার আওয়াজ শুনতে পেলো তখন তারা এমনভাবে পেছন ফিরল যেভাবে গাভী নিজের বাছুরের দিকে ফেরত আসে। আর তারা চিৎকার করে বলতে থাকল, লাব্বায়েক! লাব্বায়েক! হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা উপস্থিত, আমরা উপস্থিত! আর তারা উন্মাদের ন্যায় ফেরত আসেন এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এটি সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েত।

বর্ণনা করা হয়, যখন মুসলমান সেনাদল বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে তখন মহানবী (সা.)-এর কাছে কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আর তাদের সংখ্যা চারজন থেকে তিনশ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়ে থাকে। সংখ্যার পার্থক্যের এটিও কারণ হতে পারে যে, মহানবী (সা.)-এর একেবারে কাছে হয়ত মাত্র কয়েকজন ছিলেন আর অন্যরা বিভিন্ন স্থানে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন। আর সম্ভবত এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় তিনশ লোক ছিল। অথবা মহানবী (সা.)-এর নিকটে লোকদের সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে কমবেশি হয়ে থাকবে। যে ব্যক্তি তিন অথবা চারজন লোক দেখেছেন তিনি সেই সংখ্যা বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি দশ-বারোজন দেখেছেন তিনি সেই সংখ্যা বর্ণনা করেছেন, যিনি এরচেয়ে অধিক সংখ্যক দেখেছেন তিনি সে সংখ্যা বলেছেন। যাহোক, একটি সময় এমনও ছিল যে, তাঁর (সা.) পাশে শুধু কয়েকজন ব্যক্তিই অবশিষ্ট রয়ে যায়। অপর একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, এক ব্যক্তি হযরত বারা (রা.)-কে বলে, হে আবু আম্মারা! তুমি কি হুনাইনের দিন পালিয়ে গিয়েছিলে? তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! রসূলুল্লাহ্ (সা.) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নি, কিন্তু তাঁর (সা.) সাহাবীদের মাঝে ত্বরাপরায়ণ যুবকেরা– যাদের কাছে অস্ত্র ছিল না অথবা খুব অল্প অস্ত্র ছিল, যখন তাদের এমন তিরন্দাজ জাতির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় যাদের তির ছিল অব্যর্থ, অর্থাৎ হাওয়াযিন ও বনু নসরের দলের সাথে– (তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল।) তারা ক্রমাগত তির নিক্ষেপ করছিল আর তাদের তির খুব অল্পই লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো। সে সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) শত্রুদের দিকে অগ্রসর হন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের সাদা খচ্চরের ওপর আরোহিত ছিলেন আর আবু সুফিয়ান বিন হারেস

সেটিকে চালাচ্ছিলেন। মহানবী (সা.) নামেন এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য কামনা করেন এবং বলেন, انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب অর্থাৎ আমি নবী– একথা মোটেও মিথ্যা নয়; আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। ইয়াস বিন সালামা নিজ পিতা সালামা বিন আকওয়ার বরাতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে হুনাইন যুদ্ধের জন্য যাত্রা করি। আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হই তখন আগে অগ্রসর হয়ে আমি একটি পাহাড়ে উঠে পড়ি। সেখানে আমি শত্রুপক্ষের একজনের মুখোমুখি হই। আমি তাকে তির মারলে সে লুকিয়ে পড়ে। আমি জানি না, তার পরিণাম কী হয়েছে। আমি দেখতে পেলাম, মানুষ অন্য এক গিরিপথ থেকে বের হয়ে আসছে। তাদের এবং মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মাঝে যুদ্ধ হলো। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা পিছু হটেন, আমিও পলায়নপর হলাম। আমার গায়ে দুটি চাদর ছিল, একটি আমি বেঁধে রেখেছিলাম এবং অন্যটি আমি গায়ে জড়িয়ে রেখেছিলাম। আমার চাদর খুলতে শুরু করলে দুটিকে একত্রিত করে নিলাম এবং পিছু হটতে হটতে মহানবী (সা.)-এর সামনে দিয়ে চলে আসলাম। তিনি (সা.) সাদা-কালো রঙের একটি খচ্চরের উপর বসে ছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, আকওয়ার পুত্র কি কোনো বিপদ দেখতে পেয়েছে? সে এভাবে দৌড়ে পিছু হটছে কেন?

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হুনাইনের যুদ্ধে (শত্রুপক্ষের) তিরের আক্রমণের মুখে পালানোর ঘটনাটির উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে শত্রুদের তিরের তীব্র আক্রমণের মুখে যখন মুসলমান সৈন্যদল পিছু হটে, তখন তিনি (সা.) কেবল গুটিকয়েক সাহাবীকে সাথে নিয়ে শত্রুদের দিকে এগিয়ে যান। শত্রুদের তীব্র আক্রমণ দেখে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে (সা.) থামাতে চান। তিনি (রা.) এগিয়ে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেন। কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, আমার ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দাও। এরপর তিনি (সা.) এই পঙ্‌ক্তি পড়তে পড়তে এগিয়ে যান, انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب অর্থাৎ আমি খোদার নবী, আমি মিথ্যাবাদী নই; আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। তাঁর (সা.) এই কথা বলা যে, 'আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র'– এর ব্যাখ্যা হলো, এই মুহূর্তে শত্রুদের আক্রমণ এত তীব্র যে, তাদের চার হাজার তিরন্দাজ বৃষ্টির মতো তির নিক্ষেপ করছে। এমতাবস্থায় আমার এগিয়ে যাওয়া মানবীয় সামর্থ্যের বাইরে ও অনেক ঊর্ধ্বে মনে হতে পারে। কিন্তু এতে করে কেউ যেন ধোঁকায় না পড়ে আর এটা ভাবতে শুরু না করে যে, আমার মাঝে ঐশ্বরিক শক্তি আছে। আমি তো আব্দুল মুত্তালিবেরই পুত্র আর একজন মানুষ। আমার সাথে আল্লাহ্‌র সাহায্য কেবল আমার নবী হবার কারণেই রয়েছে।

(যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) সবাই পালিয়ে যায় নি; এ সম্পর্কেও বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম নববী লিখেছেন, সবাই পালিয়ে যায় নি। বরং মক্কার সহানুভূতিপ্রাপ্ত নওমুসলিমদের মধ্য হতে মুনাফিকরা এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মক্কার অন্যান্য লোকেরা, যারা তখনও মুসলমান হয় নি– তারা পালিয়ে যেতে আরম্ভ করে। আর শত্রুপক্ষের একযোগে তির নিক্ষেপের কারণে এই আকস্মিক পরাজয় ঘটেছিল। যাহোক, ইমাম নববীর এ কথা সঠিক যে, ভয়ভীতির কারণে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নকারী সবাই মুসলমান ছিল না; অর্থাৎ সবাই পালিয়ে যায় নি। কেবল মক্কার নওমুসলিমরা এরূপ ছিল এবং তাদের মধ্যে একটি দল সেসব মানুষেরও ছিল, যারা মন থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি। তারা তো যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লোভে বা শুধুমাত্র তামাশা বা মজা দেখার জন্য অংশ নিয়েছিল। কিন্তু এটাও সত্য যে, তাদের পলায়নের কারণে এবং প্রচণ্ড তির বর্ষণের কারণে অন্য মুসলমানদের বাহনগুলো ভড়কে গিয়েছিল এবং সেই

বাহনগুলো সে-সব মুসলমানদের নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আর একটি বিরাট সংখ্যক মানুষ এভাবেই পিছু হটেছিল যে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে পিছু হটেন নি, বরং ভীতবিহ্বল বাহনগুলোর কারণে পেছনে চলে গিয়েছিলেন; যার ফলে নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত মুসলমানরাও কিছুক্ষণের জন্য অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। যা-ই হোক, এর আরো বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে।

আজ থেকে জার্মানির সালানা জলসা শুরু হতে যাচ্ছে। সেখানে অংশগ্রহণকারী সকলের দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে জলসার উদ্দেশ্যাবলি পূরণের তৌফিক দান করেন এবং শুধু এক মেলা মনে করে যেন এখানে তারা সমবেত না হন; বরং এই দিনগুলোতে নিজেদের জ্ঞানগত, ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে স্থায়ী অগ্রগতি করার জন্য অঙ্গীকার করুন, আর এর জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। এই দিনগুলোতে বিশেষ করে যিকরে ইলাহী ও দোয়ার মাঝে সময় অতিবাহিত করুন। নিজেদের এবং নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যেমন দোয়া করবেন, তেমনিভাবে জামা'তের উন্নতি ও প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীর দুষ্কৃতি থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় লাভের এবং তাদের এই দুষ্কৃতির অবসানের জন্য ও দোয়া করুন; আল্লাহ্ তা'লা তাদের দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা করুন। পাকিস্তানে প্রতিদিন কোনো না কোনো কষ্টকর ঘটনা ঘটেই চলেছে। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্রই বিরুদ্ধবাদীদের ধৃত করার ব্যবস্থা করুন। সার্বিকভাবে পুরো বিশ্বের শান্তির জন্যও দোয়া করুন। পৃথিবীবাসী তাদের কৃতকর্মের দরুন ধ্বংসের আরো নিকটবর্তী হয়ে চলেছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই ভয়াবহ ধ্বংস থেকে রক্ষা করুন। ফিলিস্তিনীদের জন্যও দোয়া করুন। ইসরাঈলী সরকার অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। মনে হচ্ছে, তারা ফিলিস্তিনীদের ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। নিপীড়িত শিশু, নারী, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও নিরপরাধ মানুষজনের ওপর অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সর্বত্র গণহত্যা চলছে। এখন তো কোনো কোনো জাগতিক রাজনীতিবিদ ও সরকারও কিছু আওয়াজ তুলছে যে, এগুলো অন্যায়! বন্ধ করো এসব! কিন্তু ইসরাঈলী সরকার এখন তাদের কথাও শুনতে রাজি নয়। ধনসম্পদ ও ক্ষমতার নেশা তাদেরকে, আমেরিকাকে ও তাদের সমমনাদেরকে অহংকার ও অত্যাচারের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে। মুসলমান রাষ্ট্রগুলোও কিছু করছে না। যদি তারা কিছু করতে না-ই পারে, তাহলে অন্তত নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে আল্লাহ্ তা'লার সামনেই মাথা নত করুক, যেন আল্লাহ্ তা'লাই তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। হায়, তাদের যদি অন্তত এতটুকু বোধোদয় হতো! তেমনিভাবে অনেক মুসলমানও অপর মুসলমানদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও এসব অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখুন।

আজ এটি আমাদের আহমদীদেরই দায়িত্ব– যেসব স্থানে সাধ্যে কুলোয়, এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেন সরব হয়, এবং বিশেষ করে দোয়া করে ও বিগলিত চিত্তে দোয়া করে; আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এরূপ করার সামর্থ্য দান করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)